SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

অচলায়তনের গান: মুক্তির জয়গাথা

Arnab Bandyopadhyay
Assistant Professor
Pijush Kanti Mukherjee Mahavidyalaya
Sonapur, Alipurduar, West Bengal, India
Email: ghantanotfound555@gmail.com

Abstract: বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্ট কাব্য-নাটকাদিতে ঔপনিষদিক ভাবধারা সুস্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। বৈদিক ঋষি-কবির কণ্ঠের ঔপনিষাদিক বাণীকেই রবীন্দ্রনাথ তার সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন প্রকৃত উত্তরসূরীরূপে। 'অচলায়তন' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটকগুলির মধ্যে কালজয়ী ও স্বতন্ত্রতায় ভাস্বর। অচলায়তন নাটকটি রূপকধর্মী হলেও এখানে সুস্পষ্ট একটি গল্প আছে। অচলায়তন নাটকে যে গানগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলিতে আপাত আক্ষরিক সরল বাণীর অন্তরালে গভীর ঔপনিষদিক অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্যণীয়। নাটকের প্রধান চরিত্র পঞ্চক বজ্রবিদারণ মন্ত্রের "ওঁ তট তট তোতয় তোতয় ..."প্রভৃতি মন্ত্রের সম্পূর্ণ রপ্ত করতে পারে নি, যা কিনা বিগত সাত দিন ধরে সে কেবল অভ্যাসই করে চলেছে। আসলে আয়তনের সমস্ত শিষ্য যেখানে ভয়ে ভক্তিতে পিপীলিকাবৎ সারিবদ্ধভাবে আচারের নিয়ম পালনে একনিষ্ঠ ভাব দেখায়, পঞ্চক সেখানে সেই আচারকেই কুঠারাঘাত করার জন্য সততা চেষ্টাশীল। বস্তুত পঞ্চক চরিত্রকে প্রথাগত সামাজিক আচার-বিচারের কঠোর অনুশাসন অনুলিপ্ত করতে পারেনি। তাই সে সবসময়ই আয়তনের দুর্ভেদ্য প্রাচীনকে লঙ্ঘন করার জন্য সতত চেষ্টাশীল থেকেছে এবং ভয়কে জয় করে রচনা করেছে মুক্তির জয়গাথা। ধর্মকে প্রকাশ করার জন্য আচারের সৃষ্টি। কিন্তু আচার সংস্কারগুলি ধর্ম নামক বটবৃক্ষের শাখা সদৃশভাবে অবস্থান করলেই তা সর্বতোভাবে হিতকর।

Keywords: নাটক, আয়তন, উপনিষদ, আচার, সংস্কার, গীতি, শ্রুতি।

অখন্ড ভারতভূমির পবিত্র মৃত্তিকায় বৈদিক ঋষিরা শ্রুতিপরম্পরায় মানবের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিদর্শন রেখে গেছেন। তাদের সৃষ্ট সাহিত্যের গুণমান ও ভাবের ঐশ্বর্যের দীপ্তি সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট ছিল। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্ট কাব্য-নাটকাদিতে ঔপনিষদিক ভাবধারা সুস্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। তাই বলতে হয় বৈদিক ঋষি-কবির কণ্ঠের ঔপনিষাদিক বাণীকেই রবীন্দ্রনাথ তার সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন প্রকৃত উত্তরসূরীরূপে।

ঋক্ মন্ত্রের উপর সুরারোপিত করে রচিত সামবেদকে সাহিত্যগত দিক দিয়ে প্রথম গানের নিদর্শন বলা যায়। বস্তুত গীত সৃষ্টির চিন্তন অনুচিন্তন করলে প্রকৃতির বিহঙ্গের কাছ থেকেই বোধ হয় মানুষ তা প্রথম রপ্ত করেছে। এরপর সভ্যতা সংস্কৃতির রথ চক্র যতই অগ্রসর হয়েছে বাগ্দেবীর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে কবিদের মনোলোকে। বাগ্দেবীর বাণীর ছটা মহাকবিদের লেখনীতে বাগভূষণে পরিণত হয়েছে। গীতসম্রাট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষত্বই হচ্ছে তার সৃষ্ট গান ও কবিতার মধ্যে।

'অচলায়তন' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটকগুলির মধ্যে কালজয়ী ও স্বতন্ত্রতায় ভাস্বর। নাটকটি ১৩১৮ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নাটকীয় সংলাপের মধ্যে বেশ কিছু গানের সংমিশ্রণে অচলায়তন নাটকটিকে নাট্যকার অন্যমাত্রা দিয়েছেন। বস্তুত এমন কিছু কথা যা সংলাপের মাধ্যমে বললে নাটকের অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনা অব্যক্ত থেকে যায়। বিশ্বকবির লেখনী মাধুর্যের সৌন্দর্যেই এরকম অনেকগুলি কবিতারূপ গানের মধ্যে দিয়ে অচলায়তন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকরূপে পরিণত হয়েছে।

অচলায়তন নাটকটি রূপকধর্মী হলেও এখানে সুস্পষ্ট একটি গল্প আছে। স্ত্রীচরিত্রবর্জিত

নাটকটিতে পঞ্চক ও মহাপঞ্চক ভ্রাতৃসম্পর্কে আবদ্ধমান হলেও পঞ্চক প্রথাগত সংস্কারের বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর অন্যদিকে মহাপঞ্চক আয়তনের নিয়মনিষ্ঠার প্রতিমূর্তি। এই আয়তনের আশ্রমে পঞ্চক ও মহাপঞ্চক ছাড়াও জয়োত্তম, সঞ্জীব, সুভদ্র, উপাধ্যায়, বিশ্বম্ভর, তৃণাঞ্জন ও কিছু ছাত্র রয়েছে। এছাড়াও রাজা, ও শোণপাংশুর দলকে নাটকে দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটির প্রধান চরিত্র হিসেবে দাদাঠাকুরের ভূমিকা অগ্রগণ্য, তিনি একাধারে দাদা ঠাকুর আবার অন্যদিকে সবার গুরুদেব। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিবিধ আচারের ও সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায় নাটকটিতে। যেমন- বজ্রবিদারণমন্ত্র, সপ্তকুমারিকা গাথা, ধ্বজাগ্রকেয়ূরী, চক্রেশ মন্ত্র, মরীচি, মহামরিচী, পর্ণশবরী, শৃঙ্গভেরি ব্রত, ছাগলোমশোধন প্রভৃতি বিভিন্ন আচার ও সংস্কার ছিল আয়তনের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আয়তনে উক্ত ব্রত থেকে বিচ্যুত হলে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধানও ছিল।

নাটকের প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় পঞ্চক বজ্রবিদারণ মন্ত্রের "ওঁ তট তট তোতয় তোতয় ..."প্রভৃতি মন্ত্রের সম্পূর্ণ রপ্ত করতে পারে নি, যা কিনা বিগত সাত দিন ধরে সে কেবল অভ্যাসই করে চলেছে। আসলে আয়তনের সমস্ত শিষ্য যেখানে ভয়ে ভক্তিতে পিপীলিকাবৎ সারিবদ্ধভাবে আচারের নিয়ম পালনে একনিষ্ঠ ভাব দেখায়, পঞ্চক সেখানে সেই আচারকেই কুঠারাঘাত করার জন্য সততা চেষ্টাশীল। বস্তুত পঞ্চক চরিত্রকে প্রথাগত সামাজিক আচার-বিচারের কঠোর অনুশাসন অনুলিপ্ত করতে পারেনি। তাই সে আয়তনের দুর্ভেদ্য প্রাচীনকে লঙ্ঘন করার জন্য সতত চেষ্টাশীল থেকেছে এবং ভয়কে জয় করে রচনা করেছে মুক্তির জয়গাথা।

নারীচরিত্রবর্জিত কঠোর আচার বিচার অনুশাসনের কারাগারসম অচলায়তনে নাটকীয় সংলাপের মধ্যে মধ্যে বেশ কিছু গানের উপস্থাপনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রতিটি গানই সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আঘাত হানার নিত্য রূপক ধর্মী কষাঘাতস্বরূপ। অচলায়তন নাটকে যে গানগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলিতে আপাত আক্ষরিক সরল বাণীর অন্তরালে গভীর ঔপনিষদিক ভাবধারার অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্যণীয়। বর্তমান প্রবন্ধে অচলায়তনে ব্যবহৃত গানগুলির ঔপনিষদিক ও রূপকধর্মী আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

গান: তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানে না।[1]

গানটিতে পরমাত্মার প্রতি মানবাত্মার ব্যাকুলতা ধ্বনিত হচ্ছে। বিশ্বপ্রপঞ্চের নিত্যকর্মে আমরা সদা ব্যাপৃত। আচার সর্বস্ব হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজের কোন ব্রতই বালক পঞ্চকের অধিগত হচ্ছে না। সংস্কারের কলুষতা তার বালক মনকে লিপ্ত করতে পারেনি। বর্তমান জীবন স্পন্দনকে বিসর্জন দিয়ে আচারের বদ্ধ কারাগারে সে বন্দী হয়ে থাকতে চায় নি। প্রথম গানেই রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন নাটকের বীজ বপন করে দিয়েছেন। প্রকৃত গুরুর ডাকে অচলায়তনের জগদ্দল প্রাচীর ভগ্ন হবে একদিন, যে ডাক আয়তনবাসীদের কর্ণগোচর হয়নি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত বালক পঞ্চকই যেন মুক্তির জয়গাথা গেয়ে দিল প্রথম গানে।

গান: এ পথ গেছে কোনখানে গো কোনখানে-
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন পাহাড়ের পারে, কোন সাগরের ধারে,
তা কে জানে তা কে জানে।[2]

বৈদিক পর্বে দেখা যায় ঋষিদের দর্শনে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি বা উপাদান দেবতা হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন ঋষির প্রজ্ঞা দৃষ্টি বিভিন্ন দেবতার উপর স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে একদেবকেন্দ্রিকতায় সমগ্র মানবজাতির প্রার্থনা আবর্তিত হয়েছে। দেবতা বিষয়ে অজস্র চাওয়া পাওয়া সম্পর্কে আবদ্ধমান শ্রুতিসমাজের প্রার্থনার রীতিনীতি বর্তমান আধুনিক যুগেও সমানে দৃষ্ট

হয়। উপরের খোল নলচের পরিবর্তন হলেও ভিতরের অবয়ব একই রকম আছে। বস্তুত মানব জীবনের আত্ম অনুসন্ধানের একাধিক মাধ্যম থাকলেও এর পথটি খুবই দুর্বিজ্ঞেয় রহস্য। এ জগতে দুটি পথ নির্দিষ্ট আছে। একটি শ্রেয়োমার্গ আর অপরটি প্রেয়মার্গ। মানুষের মনোজগতের ভিতরে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষারূপে দুটি পথই রয়েছে। মন উভয়কেই পেতে ইচ্ছা করে। বস্তুত শ্রেয় ও প্রেয় মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। তাই তাদেরকে পৃথকীকরণের চেষ্টা অত্যন্ত কষ্টকর। বুদ্ধি দিয়ে একে আলাদা করা গেলেও সেই বুদ্ধি হতে হবে শুদ্ধ, সূক্ষ্ম ও নির্মল। নিত্য ও অনিত্য সুখের মধ্যে কোন সুখকে আমরা চাইবো সেই মনোভাব আমাদের প্রায়শই থাকে না। ধীর, ধীমান, বিবেকী ব্যক্তিই শ্রেয়কে লাভ করে। কঠোপনিষদের ঋষি তাই বলেছেন—

"শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।।"[3]

অচলায়তনের পঞ্চকের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে শ্রেয় ও ঋতমার্গের নিষ্কলঙ্ক অনির্বাচ্য স্বরূপ— 'কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি, যায় সে কাহার সন্ধানে, তা কে জানে তা কে জানে'।[4]

মানব জন্মের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হল আত্মজ্ঞানের জ্যোতিতে প্রজ্জ্বলিত হওয়া। আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য বিবিধ সাধনমার্গ প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। যেমন জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তির জন্য জ্ঞানযোগ, নিষ্কাম কর্মীগণের জন্য কর্মযোগের বিধান প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। এ জগতে কর্মহীন হয়ে কেউই থাকতে পারেনা। বস্তুত প্রকৃতিজ গুনেই আমরা কর্মে লিপ্ত হই। 'কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ।'[5]

গান: আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।[6]

কর্মময় পৃথিবীতে শোণপাংশুদের মধ্যে গানের উপস্থাপনা কার্যকারণরূপ পৃথিবীতে কর্মবাদের উদ্ঘোষণামাত্র। মাতৃরূপা পৃথিবীর বক্ষ বিদীর্ণ করে চাষিরা ফসল ফলায়। ফসল ফলানোর মধ্যে একদিকে যেমন আছে আনন্দের উদযাপন, অন্যদিকে মানবের ক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্ত কর্মসাধন। গানে রৌদ্র-বৃষ্টি পাতা নড়া, পূর্ণিমার চন্দ্র এগুলি সবই রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধিত প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই চলে আসছে। পৃথিবী মাতৃকা চাষীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ধানের শীষকে ভরিয়ে তোলে আনন্দরূপ ফলে। ফলে ভূ-ভাগ হয়ে ওঠে আনন্দ বিকশিত।

গান: সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।[7]

সকল কর্মের ফলই শুভাশুভমিশ্রিত। অগ্নি যেমন ধূমমিশ্রিত তেমনই কর্মও অশুভ মিশ্রিত। তা বলে অশুভ স্পর্শের ভয়ে কর্মত্যাগ অনুচিত। একথা প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রদিতে উক্ত হয়েছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 'যোগারূঢ়'হয়ে কর্ম করতে হবে। যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করলে 'আমি ইহা করছি' এই বোধ বিলুপ্ত হয়ে যায়। অহং বোধ বিলুপ্ত হলেই উৎকৃষ্টতর কর্ম সম্ভব হয়। কর্মের ভেদাভেদ ভুলে আমরা যদি সমস্ত কর্মকে ঈশ্বরের প্রকৃতি রাজ্যের মালির মত করতে পারি তবেই জীবের আত্মিক মুক্তি সম্ভব। বিভেদ ভুলে সম্মিলনের মন্ত্রে দীক্ষিত মানবই পারে ভেদাভেদাময় কর্মের বন্ধনময় রজ্জুকে উন্মুক্ত করে দিতে।

গান: ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্ গুনিয়ে
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।[8]

অচলায়তনের নিকেতনে দিক্ চক্রচন্দ্রিকার পুঁথি সেখানের অধ্যয়নের অন্তর্গত ছিল। দশটা দিকের রং, গন্ধের স্বরূপ নিয়ে আলোচিত এগ্রন্থ আয়তনের শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে অবশ্য পাঠ্য হলেও সরলমতি শোণপাংশুদের কাছে তা ছিল নিরর্থক শাস্ত্রীয় প্রলাপমাত্র। শোণপাংশুদের দল অস্থির, সারাদিন 'পাক খেয়ে' বেড়ালেও আয়তনের কঠোর অনুশাসিত মন্ত্র বা নিয়মগুলিকে তারা

বিন্দুমাত্র অনুসরণ করতে চেষ্টা করেনি। শোণপাংশুদের সরল বাঁধনহারা চিত্তের উদাস অনাবিল আনন্দ অনুভব করে পঞ্চক তাই এই গান বেধেছে।

বস্তুত পরমেশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন। ইন্দ্রিয়গুলির গতি তাই বাইরের দিকে। ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের বস্তু অনুভব করে বলে আন্তরাত্মার দিকে সেগুলির অনুভব নেই। জীব অন্তরাত্মাকে দেখতে পায় না। অন্তরাত্মাই হল অন্তরতম সত্য। কঠোপনিষদের ঋষি বলেছেন—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ -
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।"[9]

গানটিতে যদিও আক্ষরিকভাবে প্রকৃতিপ্রেমী মনের অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে, প্রেমের অনুভূতিতে ভ্রমরের আগমন প্রাচীন সাহিত্যে বহুল দৃষ্ট হয়। প্রেমের বার্তা বহনে ভ্রমর বৃত্তান্ত সুপ্রসিদ্ধ। তবে এক্ষেত্রে পঞ্চকের মনে ভ্রমর সৃষ্টি করেছে মুক্তির হাতছানি, অচলায়তনের অস্মিতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জয়গাথা।

অপর একটি গানে পথভ্রষ্ট পথিককে সঠিক মার্গদর্শনের উপনিষদিক ভাবধারা প্রকটিত হয়েছে।

পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে
পথ যে কোথায় সেই তা জানে
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায়
সেই তো ঘরে লবে।[10]

গুরু যেমন শিষ্যের অন্তরকে সুন্দরতম করে বিকশিত করে তোলেন তেমনি এখানে শোণপাংশুদের প্রতিনিধিস্বরূপ দাদাঠাকুর পঞ্চকের মনে সত্যান্বেষণের সুর ঝংকার সৃষ্টি করেছেন। পঞ্চকও দাদাঠাকুরের সরল নিরহঙ্কার পথকে পাথেয় করেছিলেন। দাদা ঠাকুরের অন্তরের ভাবাকর্ষণ পঞ্চকের মনকে লৌহ-চুম্বকবৎ আকর্ষণ করেছে। এই আকর্ষণ সাম্যের সরলতার এবং প্রেমের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। তাইতো পঞ্চকের কণ্ঠে বারে বারে ধ্বনিত হয়েছে সেই সুর, যেমন করে প্রকৃত গুরুর দেখা পেলে কৃপাবিষ্ট হয়ে পড়ে মানুষ।

"যেন সব ফেলে যাই, সব সব ঠেলে যাই,
যাই ধেয়ে যাই ছুটে।"[11]

শোণপাংশুদের স্বাধীন মুক্ত জীবনের বনভোজনের একটি আনন্দের ছবি নাটকায়িত করেছেন কবি। পরলোকের পিতৃপিতামহগণের উদ্দেশ্যে দীপকেতন পূজার আয়োজন চলছে অচলায়তনের প্রাঙ্গনে। কিন্তু পঞ্চকের মন পড়ে রয়েছে অনাবিল আনন্দের আকর শোণপাংশুদের মধ্যে। তাই আয়তনের পালনীয় আচার ভুলে সে পাড়ি জমিয়েছে বনভোজনের উদ্দেশ্যে। সেই আনন্দকে কবি বর্ণনা করেছেন শ্রাবণের ধারার সঙ্গে তাই তার অভিব্যক্তিও বাঁধনহারা।

নাটকের অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায় সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণী দর্ভকদের গৃহে আচার্য এসেছেন, পঞ্চক এসেছে, আয়তন থেকে তাদের নির্বাসিত করা হয়েছে। তথাপি তাদেরকে অতিথি সৎকারে বরণ করে নিতে দর্ভকদের সমারোহের অন্ত নাই। আয়তনের নিরর্থক জটিল মন্ত্র নয় বরং গানের মাধ্যমে তারা বরণ করে নিয়েছেন আচার্যদের।

"পরানখানি দিব পাতি
চরণ রেখো তাহার 'পরে।"[12]

আচার্যদের নির্বাসনের পর মহাপঞ্চকের উপরই আয়তনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন রাজা মন্থরগুপ্ত। কিন্তু দাদাঠাকুরের দল আয়তনের সুবিধাল প্রাচীর ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। ভন্ড কপটাচারী বিশ্বম্ভর, তৃণাঞ্জন প্রভৃতিরা আয়তন থেকে বাইরের পথের সন্ধানে ব্যস্ত। কেবল মহাপঞ্চকই দম্ভের ও অহংকারের প্রাচীর রক্ষা করতে এখনো অটল। আয়তনের চতুর্দিকে আলোর

সমারোহ। ছাত্রবালকরা অনির্বাচ্য ভয় ও আনন্দে ছোটাছুটি করছে। আজ আর ষড়াসন,পংক্তিধৌতির কঠোর অনুশাসন নেই, যেন খোলা আকাশ ঘরের মধ্যে চলে এসেছে।

অচলায়তনের অভ্যন্তরের মানুষেরা কঠিন অনুশাসনের কারাগারে বদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত । বাইরের জগতের নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে তাদের যোগসূত্র একেবারেই বিরল। বাস্তবিকই আমাদের সমাজেও এরকম আপাত ভদ্র বেশি দুষ্ট কপটাচারী লোক বিচরণ করে। তাদের মনে মুক্ত এই পৃথিবীর আলো বাতাস প্রবেশ করেনি বলে তারা ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত হতে পারেনি। দাদাঠাকুররূপী গুরুর আগমনে যেমন মহাপঞ্চকদের মনঃচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে তেমনি সমাজের সকল বর্ণের মধ্যে বৈষম্যতার বিসর্জন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'তপোবন' প্রবন্ধে বলেছেন- "মানুষকে বেষ্টন করে এই যে জগৎ প্রকৃতি আছে, এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশঃ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে...।"[13] বহুকালব্যাপী জীর্ণ কিছু সংস্কার সমাজের বুকে এভাবেই প্রোথিত হয়ে আছে অভ্যাস চক্রের মত। সেই কু-অভ্যাস থেকে বের করে ভগ্ন সমাজকে সংস্কার করতে দাদাঠাকুরের মত গুরুর আগমন ও প্রসঙ্গ আজও সমাজে সমানভাবে প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিক।

সামাজিক আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্রগুলি ভারতবর্ষে একটা বিশিষ্ট আসনে অলংকৃত। স্মৃতিকার মনু প্রণীত বিখ্যাত সেই উক্তি—

"বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ।।"[14]

প্রাচীন থেকে অর্বাচীন সমস্ত আচার, বিচার, ইতিকর্তব্যতা, সংস্কার সমস্ত কিছুর মূলেই আছে এই শ্লোকটি। ভারতবর্ষের সামাজিক পরিকাঠামোর ভিত্তিস্তম্ভ শ্রুতি ও স্মৃতি, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

ভারতবর্ষে নীতি বিষয়টির ব্যাপ্তি গভীরভাবে প্রসারিত। নীতি বলতে মানুষের তৈরি যে সমস্ত নিয়ম, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, সদাচার যা সাধারণ স্তর থেকে উন্নতস্তরে নিয়ে যায়। নীতির ব্যাপ্তি সুপ্রাচীন কাল থেকেই পরিদৃষ্ট হয়। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, চাণক্যনীতি থেকে শুরু করে রামায়ণ-মহাভারতেও নীতিবোধের অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। নীতি শব্দটির ব্যাপকতার কারণে প্রাচীনকালের রাজনীতি বা রাজধর্ম বিষয়ক শাস্ত্রের সঙ্গে নীতি শব্দের সংযোগ সাধনের মাধ্যমে শাস্ত্রটি অন্যমাত্রায় পৌঁছেছে। তাই বলা যায় প্রাচীনকালে নীতি ও ধর্ম প্রায় সমপর্যায়বাচী ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

উৎকৃষ্ট কিছু লাভ করতে হলে অনেক আপাত রমণীয় বিষয়ে ত্যাগ করতে হয়। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে মানবজীবনের ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ নামক শ্রেষ্ঠ চারটি উদ্দেশ্যের কথা উক্ত হয়েছে। এগুলির মধ্যে ধর্ম ও মোক্ষ অন্যগুলির চেয়ে উৎকৃষ্টতর। যারা অর্থ ও কামনার সেবায় নিয়োজিত তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান সম্ভব নয়। তাই মনুষ্য জীবনে ধর্মের অবস্থান সর্বাগ্রে। ধর্মের মূল নিহিত আছে প্রাচীন সাহিত্য বেদে। এই ধর্মকে ব্যক্ত করার জন্য যে সমস্ত আচার ও সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে কালে কালে সেগুলি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে। ধর্মকে প্রকাশ করার জন্য আচারের সৃষ্টি। কিন্তু আচার সংস্কারগুলি ধর্ম নামক বটবৃক্ষের শাখা সদৃশভাবে অবস্থান করলেই তা হিতকর। কিন্তু অচলায়তনের কবি দেখিয়েছেন যে আচার গুলি ধর্মকে অতিক্রম করে নিজেই নিজের আত্মগরিমার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে ব্যস্ত। তাই সে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রাচীন স্মৃতিকারদের সৃষ্ট যে সংস্কার প্রথা আজও সমাজে অনুস্যূত হয়ে আসছে তার একটা বড় কারণ ধর্মীয় আবেগের বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত না করা। কিন্তু সংস্কারের মধ্যে যদি আত্ম উন্নতির ও আত্মচেতনার দিক্ দর্শন না থাকে তাহলে সেই জড়তা প্রাপ্ত

সংস্কারের দ্বারা মনকে পুষ্ট করলে মন ও জাড্যতা প্রাপ্ত হয়। তাই শুধুমাত্র আচার সর্বস্ব ধর্ম সাধনা নয়, নৈতিক ধর্মবোধের চেতনা জাগ্রত হলে তবেই সমাজ বিকশিত হয়ে উঠবে ও মানবাত্মার উত্তরণ ঘটবে।

Endnotes

1. অচলায়তন
2. অচলায়তন
3. কঠোপনিষদ, 1/2/2
4. অচলায়তন
5. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 3/5
6. অচলায়তন
7. অচলায়তন
8. অচলায়তন
9. কঠোপনিষদ, 2/1/1
10. অচলায়তন
11. অচলায়তন
12. অচলায়তন
13. শিক্ষার ভিত্তি, পৃষ্ঠা-42
14. মনুসংহিতা 2/6

Bibliography

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অচলায়তন, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৯৬২।
- পাহাড়ী, অন্নদাশঙ্কর, মনুসংহিতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১০।
- গম্ভীরানন্দ, উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,১৯৬২।
- জগদীশ্বরানন্দ, জগদানন্দ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৯।
- সেন, ক্ষিতিমোহন, হিন্দু ধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২২।
- ভূতেশানন্দ, উপনিষদ ও আজকের মানুষ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৭
- ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, আচার-বিচার-সংস্কার, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৩।
- মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, শিক্ষার ভিত্তি, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৩৬২(ব:)
- সন্তোষানন্দ, উপনিষৎ সংকলন, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, কলকাতা, ২০১৬।

———